বরিস লাভরেনিওভ

বরিস লাভরেনিওভ

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে — ছোট্ট নাকটা ডগার দিকে উল্টানো, চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, গায়ে কৃত্রিম পশমে-তৈরি লালচে কলারের খাটো ওভারকোট। ঠাণ্ডা স্তেপের শুকনো হাওয়ায় গোল বড়ি নাকটি তার লাল হয়ে উঠেছে। ফেটে-যাওয়া নীল ঠোঁটদুটি হরদম কাঁপছে, তবে কালো ম্লান চোখদুটির পলকহীন ও কিছুটা কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে।

মনে হল, যুদ্ধের আগুনে ঝলসানো বয়স্কদের বিরস পৃথিবীর দিকে — এই তেরো বছর বয়সী অসাধারণ অতিথিকে ঘিরে দাঁড়ানো ব্যাটালিয়নটির কৌতূহলী নৌসেনাদের প্রতি ছেলেটির কোন খেয়ালই নেই। পায়ে যা পরেছে ছেলেটি তা মোটেই আবহাওয়ার উপযোগী নয়: ধূসর ক্যাম্বিশের জুতো, তাদের ডগা গেছে ক্ষয়ে। যে নৌসেনাটি ছেলেটিকে নিয়ে এসেছিল সে স্থানীয় সদর-দপ্তরের একখানা চিঠি দিল ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন যতক্ষণ চিঠিখানা পড়লেন, ছেলেটি ততক্ষণ ঘন ঘন পা বদলাতে থাকল।

'...ওকে আটক করা হয়েছিল ভোরে... ওর কথা থেকে বোঝা গেল যে দু'সপ্তাহ ধরে ও 'নভি পুত্' রাষ্ট্রীয় খামার এলাকায় জার্মান সৈন্যদের চলাফেরা লক্ষ্য করেছে.. আপনার কাছে পাঠাচ্ছি... ব্যাটালিয়নের পক্ষে মূল্যবান তথ্যাদি পেতে পারেন...'

চিঠিখানা ভাঁজ করে ক্যাপ্টেন ওভারকোটের পকেটে রেখে দিলেন। তখনও শান্ত ও অপেক্ষার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটি।

— কী নাম তোর?

মাথা তুলে ছেলেটি সোজা হয়ে দাঁড়াল এবার, গোড়ালিতে গোড়ালি মেলাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যথায় মুখখানি কেঁপে উঠে বেঁকে গেল। ভয়ে ভয়ে সে তাকাল তার পায়ের দিকে, মাথাটি নুয়ে পড়ল।

— কলিয়া... কলিয়া ভিখরভ্, কমরেড ক্যাপ্টেন, — বলে সে।

ক্যাপ্টেন তার পায়ের দিকে তাকালেন। ছেলেটির ছেঁড়াখোঁড়া জুতো দেখে তাঁরই কাঁপুনি ধরে গেল যেন।

— তোর জুতোজোড়া কিন্তু শীতের নয়, কমরেড ভিখরভ্। পা জমে যায় নি?

— একটু, — লাজুক ও করুণ সুরে কথাটা বলেই ছেলেটি আরও বেশি নুয়ে পড়ল।

সমস্ত শক্তি একত্র করে সে নিজেকে চাঙ্গা রাখতে চেষ্টা করছিল। ক্যাপ্টেন ভাবতে লাগলেন, এই জুতো পরে কীকরে সারা রাত সে হেঁটে এসেছে হিম-শীতল স্তেপের ওপর দিয়ে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি তাঁর গরম উঁচু কানাওয়ালা বুটের

ভেতরে পায়ের আঙুলগুলি নাড়ালেন। ছেলেটির ঠাণ্ডায় নীল-হয়ে-যাওয়া গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি এবার নরম গলায় বললেন:

— মন খারাপ করিস না। আমাদের এখানে জুতোর ফ্যাশনই আলাদা... লেফ্‌টেনাণ্ট কজুব।

নৌসেনাদের ভেতর থেকে ছোটখাটো চেহারার এক হাসিখুশি লেফ্‌টেনাণ্ট বেরিয়ে এসে স্যালুট ঠুকে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের সামনে।

— সবচেয়ে ছোট মাপের একজোড়া বুট শিগ্‌গির নিয়ে আসতে বলুন।

জোর কদমে কজুব চলে গেল হুকুম তামিল করতে। ক্যাপ্টেন ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে বললেন:

— চল্ আমার সঙ্গে। একটু গা গরম করে নিয়ে আলাপ করা যাবে।

ক্যাপ্টেনের বাঙকারে চুল্লিতে ফট্‌ফট শব্দে জ্বলছে আগুন। একজন আর্দালি শিক দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিচ্ছে লাল টক্‌টকে কাঠগুলো। দেয়ালে এখানে-ওখানে খেলছে লাল-গোলাপী আলোর আভা। ওভারকোটটি খুলে দরজার কাছে ঝুলিয়ে রাখলেন ক্যাপ্টেন। ছেলেটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল। সম্ভবত, মাটির তলায় এই শাদা ঝক্‌ঝকে আলোকোজ্জ্বল আরামের কামরাটি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে।

— কোট খুলে ফেল্, — বলেন ক্যাপ্টেন, — আমার এখানে খুব গরম। গা'টা গরম করে নে।

ছেলেটি ওভারকোট খুলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সযত্নে তা ঝুলিয়ে রাখল ক্যাপ্টেনের কোটের ওপর। পোশাকের ওপর এতটা যত্ন পছন্দ হল ক্যাপ্টেনের। ওভারকোট ছাড়তেই ছেলেটিকে ভারি রোগা-পটকা দেখাল। ক্যাপ্টেন বুঝলেন ও অনেকদিন ভালমতো খেতে পায় নি।

— বোস্। আগে কিছুটা খেয়ে নে, তারপর বাতচিত হবে। যা দেখছি, তোর পেটে কিছুই পড়ে নি, এভাবে চললে মরে যাবি। জানিস, বহুকাল আগে এক সেনাপতি ছিল। সে বলত, সেপাইকে খেতে দিলেই তার মনের নাগাল মেলে। বুড়ো কিন্তু হক কথাই বলত। সেপাইয়ের পেট ভরা থাকলে সে জনা পাঁচেক ভুখা দুশমনকে পটকে দিতে পারে... কড়া চা চলবে?

পোড়া মাটির মোটা কাপ ভরে ক্যাপ্টেন কালো সুগন্ধী চা ঢেলে দিলেন ছেলেটিকে। ধীরে ধীরে একটুকরো রুটি কেটে তাতে আঙুলের সমান পুরু করে মাখন মাখলেন ও তার ওপর দিলেন মাংসের একটা টুকরো। এত বড় স্যাণ্ডউইচ দেখে প্রায় ভয় পেয়ে গেল ছেলেটি।

— ডরাস না, — প্লেটখানা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন ক্যাপ্টেন, — চায়ে চিনি ঢাল্।

তিনি টেবিলে ঠেলে দিলেন নীলাভ, চক্‌চকে চিনির টুকরোয় ঠেসে-ভরা কার্তুজের ছয় ইঞ্চি একটি খোল। ছেলেটি ভীত ও সতর্ক দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটুকরো চিনি বেছে নিয়ে কাপের কাছে রাখল।

— হা-হা-হা! — হেসে ফেলেন ক্যাপ্টেন। — এমন করলে চলবে না। আমাদের এখানে, ভায়া, এমন করে চা খায় না কেউ। বন্দুকে ঠেসে বারুদ পুরতে হয়। আর তুই যা করছিস তাতে চায়েরই বারোটা বাজিয়ে দিবি।

এবার ক্যাপ্টেন ভারি একঢেলা চিনি ঢেলে দিলেন কাপে। ছেলেটির রোগা মুখখানা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে উঠল, টেবিলে পড়ল বড় বড় কয়েক ফোঁটা চোখের জল। গভীর নিশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন একটু এগিয়ে বসে ছেলেটির হাড্ডিসার কাঁধটি জড়িয়ে ধরেন।

— ব্যস, ব্যস, হয়েছে! — মিষ্টি গলায় সান্ত্বনা দেন ক্যাপ্টেন। — কান্নাকাটি রাখ্! যা হবার তা হয়েছে, এখানে কেউ তোর কিছু করতে পারবে না। জানিস্, আমারও ঠিক তোর মতো এক ছেলে রয়েছে বাড়িতে। তার নাম ইউরা — এই যা ফারাক। আর সবকিছু বিলকুল তোরই মতো — সেও ছুলিমুখো, আরও নাকটি বোতামের মতো।

সামান্য লজ্জিত হয়ে ছেলেটি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে।

— আমার তো কিছু হয় নি, কমরেড ক্যাপ্টেন... আমি নিজের জন্যে ভাবি না... হিম্মত আছে আমার। তবে কিনা মা'র কথা মনে পড়ল।

— আ-চ-ছা? — টেনে টেনে বলেন ক্যাপ্টেন, — মা বেঁচে আছেন?

— হ্যাঁ, বেঁচে আছেন, — ছেলেটির চোখ ছল্ছল করে উঠল। — তবে বাড়িতে খাবার নেই। রাত্তিরে মা জার্মানদের রান্নাঘরের কাছ থেকে আলুর খোসা কুড়িয়ে

আনেন। একবার ওরা তাঁকে দেখে ফেলে। বন্দুকের কুঁদো বসিয়ে দেয় হাতে। এখনও মা হাত বাঁকাতে পারেন না।

ঠোঁটদুটি সে টিপে রাখল, চোখ থেকে সরে গেল শিশুর নমনীয়তা। আর দৃষ্টিটা হয়ে রইল তীক্ষ্ন ও কঠোর। ক্যাপ্টেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

— একটু সবুর কর। মা'কে আর বাকি সব্বাইকে বাঁচিয়ে দেব আমরা। এবার একটু ঘুমিয়ে নে।

অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে ছেলেটি তাকাল তাঁর দিকে:

— ইচ্ছে নেই... পরে। আগে ওদের কথা বলে ফেলি।

তার এমন জেদী গলা শুনে ক্যাপ্টেন আর তাকে ঘুমোবার কথা বলতে ভরসা পেলেন না। টেবিলের অন্য ধারে বসে একটি নোটবই হাতে তুলে নিলেন তিনি।

— বেশ, বল্ তাহলে... তোর মতে খামারের এলাকায় কতগুলো জার্মান রয়েছে।

মাথা নেড়ে একবারও না ঠেকে ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে চলল:

— এক ব্যাটালিয়ন বাভেরিয়ান ইনফ্যান্ট্রি। সাতাশ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের একশ' ছিয়াত্তর নম্বর রেজিমেণ্ট। হল্যান্ড থেকে এসেছে ফ্রণ্টে।

— দারুণ তো! কী করে জানলি? — উত্তরের যথাযথতায় অবাক হন ক্যাপ্টেন।

— জানব না আবার! আমি যে ওদের ব্যাজের নম্বরগুলো দেখেছি। ওদের কথাবার্তাও শুনেছি। জার্মান ভাষা জানি, ইসকুলে পড়াশুনো ভালোই করতাম... কোম্পানিটা মোটরসাইক্লিস্ট আর সাব-মেশিনগানারদের। মাঝারি জাতের ট্যাংক প্লেটুনটা আছে শুয়োরের খোঁয়াড়ে। সর্বজি-ভুঁইয়ের উত্তর দিকে রাইফেল কোম্পানির বড় বড় ট্রেঞ্চ। ওখানে আছে দু'টো মজবুত ঘাঁটি। বেটারা বেশ গেড়ে বসেছে, কমরেড ক্যাপ্টেন। পুরো দশটা দিন ট্রাকে করে সিমেণ্ট টেনেছে। একশ'ন' ট্রাক ঢেলেছে। আমি জানলা দিয়ে দেখেছি সবকিছুই।

— আচ্ছা ওই ঘাঁটিগুলো ঠিক কোথায় আছে বলতে পারিস? — একটু সামনে হেলে জিজ্ঞেস করেন ক্যাপ্টেন। তিনি বুঝলেন যে তাঁর সামনে বসে আছে মামুলি কোন ছোকরা নয়, যে শুধু খুব সাধারণ তথ্যাদি দিতে পারে, তাঁর সামনে — অতি দূরদর্শী, বিবেকী আর নির্ভুল এক গুপ্তচর।

— অবশ্যই পারব... একটা আছে — সবজি-ভুঁইয়ে, পুরনো ফসল মাড়াইয়ের জায়গাটার পেছনে, যেখানটায় আছে টিলা। আর অন্যটা...

— দাঁড়া! — থামিয়ে দেন ক্যাপ্টেন। — খুবই ভাল কথা যে তুই সবকিছু দেখেছিস আর মনে রেখেছিস। কিন্তু জানিস তো আমরা তোদের খামারে কখনও যাই নি বা থাকি নি। কোনখানে সবজি-ভুঁই, কোনখানেই বা মাড়াইয়ের জায়গা — সবই আমাদের অজানা। দশ-ইঞ্চি ক্যালিবারের কামান তো আর খেলার কথা নয় দোস্ত। ধর্, আমরা না হয় আন্দাজী তোপ দাগলাম, কিন্তু তাতে ঝুটমুট অনেক ক্ষতি

হতে পারে। ওখানে তো আমাদেরও লোক রয়েছে... তোর মাও... তুই সবকিছু এঁকে দেখাতে পারবি?

ছেলেটি মাথা তুলল। দৃষ্টিতে ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া ভাব। বলল:

— আপনার কাছে কোন ম্যাপ-ট্যাপ নেই, কমরেড ক্যাপ্টেন?

— ম্যাপ আছে... তবে তুই তা দেখে বুঝবি কিছু?

— হুঃ, কী যে বলেন! — রাগ করে ছেলেটি, — আমার বাবা জিওডেজিস্ট। আমি নিজে ম্যাপ আঁকতে পারি। খুব পরিষ্কার না হলেও, পারি... বাবাও এখন আর্মিতে, স্যাপারদের কমাণ্ডার, — সগর্বে বলে যায় সে।

— দেখা যাচ্ছে তুই তাহলে মামুলি ছেলে নোস, তুই একেবারে হীরের টুকরো, — টেবিলে ম্যাপখানা বিছতে বিছতে তামাসা করেন ক্যাপ্টেন। ছেলেটি টেবিলের ওপর হাঁটুর ভর দিয়ে ম্যাপের ওপর নুয়ে পড়ে। অনেকখন দেখল সে, তারপর মুখটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ আঙুল দিয়ে ম্যাপখানার একটা জায়গায় একটু ফুটো করে দিল সে।

— এই যে এখানে! — ছেলেটির চোখেমুখে খুশির হাসি ফুটে উঠল। — সবকিছু যেন একেবারে আঙুলের ডগায়। ম্যাপখানা আপনার কী ভালো! সবকিছু আছে এতে। সবকিছুই স্পষ্ট। এই এখানে খাদের পেছনেই পুরনো মাড়াইয়ের জায়গা।

নির্ভুলভাবে ম্যাপের সমস্তকিছু বুঝতে পারে ছেলেটি, আর ক্যাপ্টেন লক্ষ্যস্থলের

চারদিকে হাতে আঁকা লাল ক্রুশচিহ্নগুলি দিয়ে ম্যাপটিকে ভরে ফেলতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন দারুণ খুশি। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসেন তিনি।

— বাঃ, সাবাস কলিয়া! — ছেলেটির হাত ধরে খুব তারিফ করেন তিনি। বলেন, — খাসা ছেলে তুই!

প্রকৃত স্নেহের স্পর্শ অনুভব করে ছেলেটি মুহূর্তের জন্যে যেন ফিরে গেল শৈশবে, শিশুরই মতো সোহাগে গলে সে তার গালটি রাখল ক্যাপ্টেনের হাতের তালুতে। বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন ম্যাপটি ভাঁজ করতে লাগলেন। পরে বললেন:

— কমরেড ভিখরভ্, এবার আমাদের নিয়ম মোতাবেক ঘুমনো দরকার।

ছেলেটি আর আপত্তি জানাল না। পেট ভরে খাওয়া হয়েছে তার, জায়গাটিও বেশ মোলায়েম গরম, কাজও শেষ। ঘুমে সে ঢুলছে। বুজে আসছে চোখের পাতা। মিষ্টি হাই তুলল সে। ক্যাপ্টেন ছেলেটিকে খাটের ওপর শুইয়ে ওভারকোট দিয়ে ঢেকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ল। নিজের স্ত্রী ও ছেলের কথা মনে পড়াতে কিছুক্ষণ তার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলেন ক্যাপ্টেন, তারপর টেবিলে ফিরে গিয়ে বসে ছকতে শুরু করে দিলেন গোলাবর্ষণের পরিকল্পনা। কাজে তিনি এতই ডুবে গেলেন যে সময়ের হিসেব রইল না তাঁর। সামান্য একটা আওয়াজে হঠাৎ তাঁর চমক ভাঙল। দেখলেন, ছেলেটি উঠে বসে আছে খাটে। মুখে তার উৎকণ্ঠার ছাপ।

— ক'টা বাজে, কমরেড ক্যাপ্টেন?

— ঘুমো তো। সময়ের কথা গুলি মার্। আমরা তোকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেব।

কিন্তু ছেলেটি প্রবোধ মানল না এতে। মুখখানা তার কালো হয়ে এল। জেদ ধরে তাড়াতাড়ি সে বলল:

— না, না। আমাকে ফিরতে হবেই। মা'কে আমি কথা দিয়েছি। মা ভাববেন আমাকে হয়তো মেরে ফেলেছে। সন্ধে হলেই আমি চলে যাব।

ক্যাপ্টেন তো অবাক। তিনি ভাবতেই পারেন না যে রাতের স্তেপে ছেলেটি আবার পাড়ি দেবে ভয়ঙ্কর এক পথ, যা একবার সে দৈবাৎ অতিক্রম করতে পেরেছে। ক্যাপ্টেনের মনে হল, হয়তো তাঁর অতিথির ঘুম এখনও ঠিক মতো ভাঙে নি, হয়তো সে ঘুমের ঘোরেই কথা বলছে।

— কী বাজে বকছিস! — বলেন তিনি। — কে তোকে ছাড়বে? জার্মানদের হাতে যদি না-ও পড়িস, তো খামারে পেঁছে হয়তো আমাদের গুলিতেই খতম হয়ে যাবি। হুঃ, দেখছি শেষকালে তোকেই আমার মারতে বাকি! পাগলামি রাখ তো। ঘুমো।

লাল হয়ে উঠে ছেলেটি কপাল কোঁচকাল:

— জার্মানদের হাতে আমি পড়ব না। রাত্তিরে ওরা বেরয় না। বেটাদের ভীষণ শীতের ভয়, খুব নাক ডাকায়। আর আমার সব পথ একেবারে মুখস্থ। দোহাই আপনার, আমায় ছেড়ে দিন।

অক্লান্ত অনুনয় করে চলল সে, অনেকটা যেন ভয় পেয়েই। ক্ষণিকের জন্যে ক্যাপ্টেনের একবার মনে হল: 'আচ্ছা, ছোকরাটির এখানে আবির্ভাব আর তার গল্প কোন মনগড়া কমেডি বা ছলনা নয় তো?' কিন্তু তার উজ্জ্বল করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের এমনতরো সন্দেহের জন্যে নিজেরই লজ্জা হল ক্যাপ্টেনের।

— আপনি তো জানেন, কমরেড ক্যাপ্টেন, জার্মানরা কাউকে খামার ছেড়ে যেতে দেয় না। হঠাৎ হয়তো এসে দেখবে — আমি বাড়িতে নেই। তখন মা'কে আর আস্ত রাখবে না।

বিষণ্ন তার কণ্ঠস্বর। তাতে ছেলেমানুষির চিহ্ন মাত্র নেই। বোঝা গেল, সত্যিই সে মায়ের জন্যে চিন্তিত।

— চিন্তা করিস না। সবই বুঝেছি, — ঘড়ি বের করে বলেন ক্যাপ্টেন, — মা'র কথা যে ভাবছিস সে খুবই ভাল কথা... এখন বিকেল সাড়ে চারটে। চল্, আমরা মাচানে উঠে আরও একবার সবকিছু দেখে নিই। কথা দিচ্ছি, সন্ধে হতেই আমাদের ছেলেছোকরারা তোকে যতদূরে পারে পৌঁছে দিয়ে আসবে। বুঝলি?

মাচানে উঠে ক্যাপ্টেন বসলেন দূরত্ব-মাপা যন্ত্রের কাছে। তিনি দেখতে পান, গিরিখাতে বাতাসে-নিয়ে-আসা তুষারের ধূসর-হলদে ঢেউয়ে ঢাকা ক্রিমিয়ার বন্ধুর স্তেপ। স্তেপের ওপর মিলিয়ে আসছে গোধূলির রক্তিম আভা। দিগন্তে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে দূর খামারের সরু সারিবদ্ধ বাগিচা। অনেকখন

ধরে ক্যাপ্টেন তাকিয়ে রইলেন বাগানগুলির দিকে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ল এখানে-ওখানে ছড়ানো শাদা ছোট ছোট বাড়ি। ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন।

— দেখ্ দেখি। মা'কে দেখতে পাস কিনা...

ঠাট্টা বুঝে ছেলেটি হাসল। মাথা নুইয়ে সে আইপীসের ভেতর তাকাল। অতিথিকে তার ঘরবাড়ির দৃশ্য দেখানোর জন্যে ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে দিগন্ত বরাবর যন্ত্রটি ঘোরাতে থাকলেন। সহসা ছেলেটি বিস্মিত হয়ে আইপীস থেকে চোখ সরিয়ে পেছনে হটে গেল আর ক্যাপ্টেনের আস্তিন ধরে টানতে শুরু করল।

— পাখির বাসা! আমার পাখির বাসা, কমরেড ক্যাপ্টেন। মাইরি বলছি।

বিস্মিত ক্যাপ্টেন তাকালেন আইপীসে। ন্যাড়া পপলার আর মরচে-ধরা সবুজ ছাদের চেয়েও উঁচুতে লম্বা খুঁটির ওপর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বাক্স। ধূসর-কালো মেঘের গায়ে ক্যাপ্টেন পরিষ্কার দেখতে পেলেন বাক্সটি। অবশেষে মাথা তুলে ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন কয়েক মিনিট। পাখির বাসা দেখায় তাঁর মাথায় এক ঝাপসা চিন্তার উদয় হল ও তা ক্রমশই তাঁকে অভিভূত করতে লাগল। ছেলেটিকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে তিনি তাকে চুপিচুপি কী যেন বললেন।

— বুঝলি? — কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করেন ক্যাপ্টেন। ছেলেটি একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠে মাথা নাড়ায়।

আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। সমুদ্র থেকে বইল শীতের হাড়-কাঁপানো কনকনে

ঠাণ্ডা বাতাস। ক্যাপ্টেন ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন কোম্পানি কমাণ্ডারের কাছে। কমাণ্ডারকে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন তিনি, তারপর বললেন ছেলেটিকে গোপনে খামার অবধি পৌঁছে দিয়ে আসতে। দু'জন নৌসেনা ছেলেটির সঙ্গে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। যতক্ষণ না ছেলেটির নতুন বুটজোড়ার চকমকানি বন্ধ হল, ক্যাপ্টেন তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। চারিদিকে নৈঃশব্দ্য, তবুও ক্যাপ্টেন আতঙ্ক নিয়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকলেন — হঠাৎ কোন গুলির আওয়াজ শোনা যায় কিনা। আধঘণ্টা অপেক্ষা করে অবশেষে তিনি চলে গেলেন।

রাত্রে ঘুম এল না তাঁর। ঘন ঘন চা খেলেন আর কাগজপত্র পড়তে লাগলেন। ফর্সা হওয়ার আগে উঠলেন গিয়ে মাচানে। আর যে মুহূর্তে আসন্ন দিনটির ধূসর পূর্বাভাসে চোখে পড়ল খুঁটির ওপর বসানো কালো বাক্সটি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জঙ্গী মেজাজ উঠল চাঙ্গা হয়ে। হুকুম দিলেন তিনি। নিশানা ঠিক করে ছোড়া একঝাঁক গোলার প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল স্তেপের নিস্তব্ধতা। শূন্য স্তেপের ওপর অনেকখন ভেসে রইল সেই শব্দ। ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি তখন আইপীসে নিবদ্ধ। তিনি পরিষ্কার দেখতে পান, খুঁটির ওপর কালো বাক্সটি বেশ একটু দুলে উঠল। দু'বার... তারপর সামান্য থেমে আরও একবার।

— গোলা নিশানা ছাড়িয়ে ডাইনে চলে গেল, — বলেন ক্যাপ্টেন। তারপর নিশানা ঠিক করে নিতে হুকুম দেন। এবার পাখির বাসাটি আর দুলল না। দুটি কামান থেকে ক্যাপ্টেন গোলা দাগতে লাগলেন। গোলন্দাজের স্বভাবসিদ্ধ সজাগ দৃষ্টিতে

তিনি দেখলেন, অসংখ্য বিস্ফোরণের ফলে কীভাবে ঊর্ধ্বমুখে ছুটে চলেছে কড়ি বরগা আর কংক্রিটের চাঁই। অল্প একটু বাঁকা হেসে আরও তিন ঝাঁক গোলা দাগলেন, তারপর নিশানা বদলালেন। আবারও পাখির বাসাটির সঙ্গে হয় তাঁর দিলখোলা আলাপ। একমাত্র তিনিই বোঝেন তার ভাষা। তৃতীয়বার গোলা পড়ল গিয়ে ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে রয়েছে তেল আর গোলা-বারুদের গুদাম। এবার আর ক্যাপ্টেনের নিশানায় ভুল হয় না — প্রথমবারেই লক্ষ্যভেদ। দিগন্ত ছেয়ে গেল প্রশস্ত অনুজ্জ্বল অগ্নিশিখায়। নিচের ধু-ধু আগুনে আলোকিত ধোঁয়ার সারি সারি ছাইরঙা, বাদামী কুণ্ডলী দিগন্ত বেয়ে উঠতে লাগল আকাশে। গাছপালা, বাড়ির ছাদ, পাখির বাসা — সবকিছুই ডুবে গেল তাতে। বিস্ফোরণে ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল মাটি। ক্যাপ্টেনের আশঙ্কা হল, তাঁর গোলাগুলিতে না জানি খামারের কত ক্ষতিই হয়েছে।

টেলিফোন বেজে উঠল। তোপ দাগা বন্ধ করতে বলা হচ্ছে। এবার নৌসেনারা আক্রমণ শুরু করল, ছুটল জার্মান ট্রেঞ্চগুলোর দিকে। ক্যাপ্টেন তখন কজুবকে দিলেন সৈন্য পরিচালনার ভার, আর নিজে মোটরসাইকেলে লাফিয়ে উঠে তা হাঁকালেন খোলা মাঠে। তাঁর আর তর সইছিল না। খামার থেকে ভেসে আসছিল মেশিনগান আর বোমা-ফোটার শব্দ। ব্যাটালিয়নের শক্তি আর অব্যর্থ নিশানায় হতবুদ্ধি জার্মানরা সব আশ্রয়স্থল হারিয়ে পিছু হটছিল তখন, — প্রায় কোনরকম প্রতিরোধই করছিল না তারা। মোটরসাইকেল ছেড়ে ক্যাপ্টেন এবার মাঠের ওপর দিয়ে ছুটলেন খামারের দিকে। তিনি এমন পথ ধরলেন যেখানে আগে মানুষের আবির্ভাবই ছিল বিপজ্জনক।

খামারে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে লাল নিশান। তা থেকে বোঝা গেল যে শত্রুরা সরে পড়েছে। বাগানের ওপর ভাসছে জ্বলন্ত পেট্রলের রুপোলী ধোঁয়া, থেকে থেকে কানে আসছে আগুনের মধ্যে গোলা-বারুদ ফাটার চাপা শব্দ। ক্যাপ্টেন ছুটছেন মাথা-ভাঙা পপলারের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সবুজ ছাদ লক্ষ্য করে। দূর থেকেই বেড়ার আগড়ের কাছে তিনি দেখতে পান স্কার্ফ-পরা এক মহিলাকে। তাঁর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে। ক্যাপ্টেনকে ছুটে আসতে দেখে ছেলেটি দৌড়ে এল তাঁর দিকে। ছুটন্ত অবস্থাতেই ক্যাপ্টেন তুলে নিলেন ছেলেটিকে, শূন্যে ছুড়ে লুফে নিয়ে চুমু দিতে লাগলেন তার গালে, ঠোঁটে আর চোখে। তবে খুব সম্ভব ওই মুহূর্তে ছেলেটির আর নেহাত বাচ্চা হয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। সে সর্বশক্তিতে ক্যাপ্টেনের বুকে হাতের ঠেকো দিয়ে নিজেকে তফাত করে রাখল আর চেষ্টা করতে লাগল তাঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে। অবশেষে ক্যাপ্টেন তাকে ছেড়ে দিলেন।

কলিয়া সরে দাঁড়াল। তারপর স্যালুট করে সগর্বে বলল:

— কমরেড ক্যাপ্টেন, গুপ্তচর কলিয়া ভিখরভ্‌ সামরিক কর্তব্য পালন করেছে।

— সাবাস, কলিয়া ভিখরভ্‌, — বলেন ক্যাপ্টেন, — বহুত সুক্রিয়া!

মহিলাটি এবার কাছে এগিয়ে এলেন। চোখে তাঁর নির্যাতনের ছাপ, হাসিতে ক্লান্তি। লাজুকভাবে হাতটি বাড়িয়ে দেন ক্যাপ্টেনের দিকে।

— ও তোমাদের জন্যে কী অপেক্ষাটাই না করেছে!.. সবাই আমরা তোমাদের পথ চেয়ে ছিলাম। বেঁচে থাকো, বাপেরা!

ক্যাপ্টেনকে তিনি আন্তরিক রুশী অভিবাদন জানালেন। মা'র ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কলিয়া এবার ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

— কাজ কিন্তু করেছিস খাসা!.. গোলাগুলি ছোটার সময় চিলেকোঠায় থাকতে ভয়-টয় করে নি তো? — জিজ্ঞেস করেন ক্যাপ্টেন।

— বাপরে বাপ! সে যে কী ভয়ংকর, কমরেড ক্যাপ্টেন, — অকপটে বলে ছেলেটি, — পয়লা গোলা যেই পড়ল অমনি সর্বকিছু টলতে লাগল, ভাবলাম সব বুঝি ভেঙে পড়বে। অল্পের জন্যে আমি ছুট দিই নি চিলেকোঠা থেকে। তবে লজ্জাও হল দারুণ। কাঁপছি আর নিজেই নিজেকে বলছি তখন: 'বোস্! বসে থাক্! বেরনো মানা!' তাই বসে থাকলাম যতক্ষণ না গোলা-বারুদের গুদামে আগুন লাগল... নিজেরই মনে নেই কীভাবে শেষ পর্যন্ত নিচে গড়িয়ে পড়েছি।

প্রবল আবেগে অভিভূত আর অপ্রতিভ হয়ে ক্যাপ্টেনের ওভারকোটে মুখ গুঁজে দিল ছোট্ট এই রুশী মানুষটি, তেরো বছর বয়সের বীর কলিয়া। তবে মানুষটি ছোট হলেও তার প্রাণটি কিন্তু ছিল বড়। এটা তার জাতিরই প্রাণ।

মে, ১৯৪২ সাল

অনুবাদ: বিজয় পাল
ছবি এঁকেছেন: ইউ. ফমেঙ্কো

Б. ЛАВРЕНЁВ
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Б $\frac{70802-699}{014(01)-78}$ 688-77